চাচা কাহিনী

সৈয়দ মুজতবা আলী

বিধবা-বিবাহ

আমাদের পুজো-সংখ্যা ইংরেজের ক্রিস্‌মাস্‌ স্পেশালের অনুকরণে জন্মলাভ করেছিল কি না সে-কথা পণ্ডিতেরা বলতে পারবেন, কিন্তু এ-কথা ঠিক যে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ইংরিজি স্পেশালের চেয়ে অনেক বেশী তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যাচ্ছে। ক্রিসমাস সংখ্যাগুলোতে থাকে অসংখ্য ছেলেমানুষি গল্প আর এন্তার গাঁজা-বছরের আর এগারো মাস ইংরেজ হাঁড়িপানা মুখ ক'রে থাকে বলে ঐ একটা মাস সে মুখের সব লাগাম ছিড়ে ফেলে যা খুশী তাই বকে নেয়। আমাদের পুজো সংখ্যায় এ-সব পাতলামি থাকে না; তাই ভেবে পাইনে সত্যি-মিথ্যেয় মেশানো এদেশের আজগুবি গল্পগুলো ঠাঁই পাবে কোথায়, কোন্‌ মোকায়?

এতদিন ইংরেজের নকল করতে বাধো বাধো ঠেকত। ভয় হ'ত পাছে লোকে ভাবে 'খানবাহাদুরির' তালে আছি। এখন পুজোর গাঁজায় দম দিয়ে দুচারখানা গুল ছাড়তে আর কোনো প্রকারের বাধা না থাকারই কথা। অবশ্য সত্যি-মিথ্যের মেকদার যাচাইয়ের জন্য পাঠক জিম্মাদার।

বরোদার ভূতপূর্ব মহারাজা তৃতীয় সয়াজী রাও-এর কথা এদেশের অনেকেই জানেন। ইনি বিলেত থেকে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, মৌলানা মুহম্মদ আলীকে এবং এদেশ থেকে রমেশচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুত অ্যাম্বেডকরকে বেছে নিয়ে বরোদার উন্নতির জন্য নিয়োগ করেন। এককালে প্রবাসীতে এঁর সম্বন্ধে অনেক লেখা বেরিয়েছিল। বরোদারাজ্যের দুএকজন বৃদ্ধের মুখে আমি শুনেছি, অরবিন্দ বাঙলাদেশে যে আন্দোলন আরম্ভ করেন তাতে নাকি সয়াজী রাও-এর গোপন সাহায্য ছিল।

ইনি আসলে রাখাল-ছেলে। বরোদার শেষ মহারাজা ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে গদিচ্যুত হলে পর, ইনি তাঁর নিকটতম আত্মীয় বলে এঁকে দূর মহারাষ্ট্রের মাঠ থেকে ধরে এনে গুজরাতের বরোদা রাজ্যের গদিতে বসানো হয়। তখন তাঁর বয়স ষোলর কাছাকাছি।বরোদার তখন এমনি দুরবস্থা যে দিবা-দ্বিপ্রহর নেকড়ে বাঘ শহরের আশপাশ থেকে মানুষের বাচ্চা ধ'রে নিয়ে যেত—সরকারী চাকুরেদের বছর

suman_ahm@yahoo.com

তিনেকের মাইনে বাকি থাকতো ব'লে দেশটা চলতো ঘুষের উপর, আর তাবৎ বরোদা স্টেটের ঋণ নাকি ছিল ত্রিশ কোটি টাকার মত।

সয়াজী রাও প্রায় বাষট্টি বৎসর রাজত্ব করেন। সারদা এ্যাক্ট পাস হবার বহু পূর্বেই তিনি নিজে জোর করে আইন বানিয়ে আপন রাজ্যে বাল্যবিবাহ বন্ধ করেন, খয়রাতি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালান, হিন্দু লগ্নচ্ছেদের (ডিভোর্স) আইন চালু করেন, গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরী খোলার বন্দোবস্ত করেন ও মরার সময় স্টেটের জন্য ত্রিশ কোটি টাকা রেখে যান। বরোদা শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় কলকাতাকে হার মানায়, সে পাল্লা দেয় বোম্বাই বাঙালোরের সঙ্গে।

এই মহারাজাই দিল্লীর দরবারে ইংরেজ রাজার দিকে পিছন ফিরে, ছড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে,গটগট করে বেরিয়ে এসেছিলেন বলে তাঁর গদি যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অরবিন্দের ব্যাপারে ইংরেজ তাঁর উপর এমনিতেই চটা ছিল তার উপর এই কাণ্ড—এরকম একটা অজুহাত ইংরেজ খুঁজছিলও বটে। এ-ব্যাপার সম্বন্ধে স্বয়ং সয়াজী রাও লিখেছেন, "ইংরেজ আমাকে গদিচ্যুত করতে চেয়েছিল 'বাই গিভিং দি ডগ্ এ ব্যাড্ নেম্'।" তিনি দরবারে হিজ ম্যাজেস্টিকে কতটা অসৌজন্য দেখিয়েছিলেন সে-সম্বন্ধে নানা লোকের নানা মত, কিন্তু ফাঁড়াটা কাটাবার জন্য তিনি যে লাখ পনরো ঘুষ দিয়েছিলেন সে-সম্বন্ধে সব মুনিই একমত। ব্রিটিশ প্রেসেরও চাপ নাকি ভালো ক'রে তেল ঢাললে ঢিলে হয়ে যায়।

এসব কথা থেকে সাধারণ লোকের ধারণা করা কিছুমাত্র অন্যায় নয় যে সয়াজী রাও খাণ্ডার বিশেষ ছিলেন। তা তিনি ছিলেনও, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তাঁর রসবোধ ছিল অসাধারণ—শুধু রাজারাজড়াদের ভিতরেই নয় জনসাধারণের পাঁচজন বিদগ্ধ লোককে হিসেবে নিলেও।

সার ভি. টি. কৃষ্ণমাচারীর নাম অনেকেই শুনেছেন। ইনি কিছুদিন পূর্বেও জয়পুরের দেওয়ান (প্রধানমন্ত্রী) ছিলেন ও উপস্থিত কোথায় যেন আরো ডাঙর নোকরি করেন। ইনি যখন বরোদার দেওয়ানরূপে আসেন তখন তিনি উত্তর ভারতে সম্পূর্ণ অপরিচিত, এবং আর কিছু পারুন আর নাই পারুন, একথা সত্যি, বক্তৃতা দিতে গেলে তাঁর টন্‌সিল আর জিভে প্যাঁচ খেয়ে যেত। এখনো সে উৎপাতটা সম্পূর্ণ লোপ পায়নি।

শুনেছি তিনি যখন বরোদায় এলেন তখন 'সয়াজী বিহার ক্লাব' তাঁকে একখানা যগ্যির দাওয়াত দিলে। স্বয়ং মহারাজ উপস্থিত। শহরের কুতবমিনাররা সব বোম্বাই বোম্বাই লেকচর ঝাড়লেন, ভি. টি'র মত মানুষ হয় না, এক এ্যাডাম হয়েছিলেন আর তারপর ইনি, মধ্যিখানে স্রেফ সাহারা ইত্যাদি ইত্যাদি।

কুতুবরা 'ভি. টি'কে সপ্তম-স্বর্গে চড়িয়ে দিয়ে যখন থামলেন তখন,—

'কৃষ্ণমাচারী-পানে সয়াজী রাও হাসিয়া করে আঁখিপাত।

চোখের পর চোখ রাখিয়া মৃক কহিল ওস্তাদ জি,

ভাষণ ঝাড়ো এবে উম্‌দা ভাষণ, ভাষণ এরে বলে ছি।'

'ভি. টি'র শত্রুরা বলে তাঁর পা নাকি তখন কাঁপতে শুরু করেছিল। অসম্ভব নয়, তবে একথা ঠিক, তিনি অতি কষ্টে, নিতান্ত যে ধন্যবাদ না দিলেই নয়, তাই বলে ঝুপ করে চেয়ারে বসে পড়েছিলেন।

সর্বশেষে মহারাজার পালা। বুড়া বলতেন খাসা ইংরেজি। অতি সরল এবং অত্যন্ত চোস্ত—সর্বপ্রকার অপ্রয়োজনীয় অলঙ্কার বিবর্জিত।

সামান্য দু-একটা লৌকিকতা শেষ করে সয়াজী রাও বললেন, 'দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ধরে বরোদা রাজ্য চালনা উপলক্ষে আমি বহু মহাজনের সংস্রবে এসেছি এবং তাঁদের সকলের কাছ থেকেই আমি কিছু-না-কিছু শিখে আমার জীবন সমৃদ্ধিশালী করেছি। এই দিওয়ানের কাছ থেকে শিখলুম বাকসংযম।'

শক্তিশেল খেয়ে লক্ষ্মণ কি করেছিলেন রামায়ণে নিশ্চয়ই তার সালঙ্কার বর্ণনা আছে—পাঠক সেটি পড়ে নেবেন।

ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি সয়াজী রাও-এর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। পাভলোভা এদেশে আসার বিশ বৎসর পূর্বে তিনি ভরতনাট্যম উত্তর ভারতে চালু করবার জন্য একটা আস্ত 'ট্রুপ' নিয়ে বিস্তর জায়গায় নাচ দেখিয়েছিলেন। উত্তর ভারত তখনও তৈরী হয়নি বলে দক্ষিণ-কন্যাদের সে-নৃত্যের কথা আজ সবাই ভুলে গিয়েছে।

বরোদার 'ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট' দেশ-বিদেশে যে খ্যাতি অর্জন করেছে তার সঙ্গে ভারতীয় অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের তুলনা হয় না। এ স্থলে ঈষৎ অবান্তর হলেও বলবার প্রলোভন সম্বরণ করতে পারলুম না যে, প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ শ্রীযুত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য—ইনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পুত্র।

সয়াজী রাও-এর অনুরোধেই শিল্পী নন্দলাল বসু বরোদার 'কীর্তিমন্দিরের চারখানি' বিরাট প্রাচীর চিত্র এঁকে দিয়েছেন। নন্দলাল এত বৃহৎ কাজ আর কোথাও করেননি।

নীচের কিম্বদন্তীটি পড়ে পাছে কেউ ভাবেন সয়াজী রাও ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান ছিলেন না, তাই তাঁর বহু কীর্তি থেকে এই সামান্য দু-একটি উদাহরণ দিতে বাধ্য হলুম।

গল্পটি আমাকে বলেছিলেন পুব বাঙলার এক মৌলবী সায়েব—খাস বাঙাল ভাষায় বিস্তর আরবী ফারসী শব্দের বগ্‌হার দিয়ে। সে ভাষা অনুকরণ করা আমার অসাধ্য। গ্রামোফোন রেকর্ড পর্যন্ত তার হুবহু নকল দিতে পারে না।

নস্যিতে ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের মত ব্রহ্মটান দিয়ে বললেন—'এই বরোদা শহরে কত আজব রকমের বেশুমার চিড়িয়া ওড়াউড়ি করছে তার মধ্যিখানে সয়াজী রাও কেন যে

চিড়িয়াখানা বানিয়েছেন বলা মুশকিল। তিনি নিজে তো সিঙি, অমুক ব্যাটা গাধা, অমুক শালা শূয়োর, অমুক হারামজাদা বিচ্ছু, আর আমি নিজে তো একটা আস্ত মর্কট, না হলে এদেশে আসবো কেন? —এসব মজুদ থাকতে চিড়িয়াখানা বানাবার মতলব বোধ করি জানোয়ারগুলোকে ভয় দেখাবার জন্য, যদি বড্ড বেশী তেড়িমেড়ি করে তবে খাঁচা থেকে বের করে বড় বড় নোকরি তাদের দিয়ে দেওয়া হবে।

বাইরের জানোয়ারগুলোর জ্বালায় অস্থির হলে আমি হামেশাই চিড়িয়াখানায় যাই। খুদখেয়ালি অর্থাৎ আত্মচিন্তার জন্য জায়গাটি খুব ভালো। তা সেকথা যাক।

সয়াজী রাও বহু জানোয়ার এনেছেন বহু দেশ ঘুরে। পৃথিবীটা তিনি ক'বার প্রদক্ষিণ করেছেন, তার হিসেব তিনি নিজেই ভুলে গিয়েছেন। একবার বিলেত যাবার সময় তাঁর পরিচয় হল হাবশী দেশের রাজা হাইলে সেলাসিসের সঙ্গে।

আমাদের দেশের লোক সাদা চামড়ার ভক্ত, যে যত কালো সাদা চামড়ার প্রতি তার মোহ তত বেশী, ইয়োরোপে নাকি কালো চামড়ার আদর ঠিক সেই অনুপাতে। একমাত্র হাবশীরাই শুনেছি আপন চামড়ার কদর বোঝে। তাই সায়েবদের দিকে তারা তাকায় অসীম করুণা নিয়ে— আহা, বেচারীদের ও-রকম ধবল কুষ্ঠ হয় কেন?

সয়াজী রাও-এর রঙ কালো। হাবশী রাজা প্রথম দর্শনেই বুঝে ফেললেন, আমাদের মহারাজার খানদান অতিশয় শরীফ; কোনো রকমের বদ্-জাত ধলা খুন তার কুলজি-ঠিকুজিতে কভি-ভী দাখিল হতে পারেনি। এ খুনের জন্য আমীর-ওমরাহ,নোকর-খিদমৎগার আপন খুন বহাতে হামেহাল হরবকত হাজির।

হাবশী-রাজ সয়াজী রাও-এর দরাজদিলের নিশানও ঝট্‌পট পেয়ে গেলেন। জাহাজেই রাজার জন্মদিন পড়েছিল—সয়াজী রাও তাঁকে একখানা খাসা কাশ্মীরী শাল ভেট দিলেন। হাবশী সে-শাল পেয়ে খুশীর তোড়ে বে-এক্তেয়ার। জাহাজময় ঘুরে-ফিরে সবাইকে সে-শাল দেখালেন, লালদরিয়ার গরমিকে একদম পরোয়া না করে সেই লাল শাল গায়ে দিয়ে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করলেন। চোরচোট্টার ভয়ে শেষতক্ তিনি শালখানা কাপ্তান সায়েবের হাতে জিম্মা দিলেন। হাবশী-রাজও কিছু নিকৃষ্ট মনুষ্য নন। সয়াজী রাও-এর দিল-তোড় মহব্বতের বদলে তিনি কি সওগাত দেবেন সে বাবতে বহুৎ আন্দিশা করেও তিনি কোন ফৈসালা করে উঠতে পারলেন না। তাঁর রাজত্বে আছেই বা কি, দেবেনই বা কি? দুশ্চিন্তায় হাবশী রাজার কালো মুখ আরো কালো হয়ে গেল।'

আমি বললুম, 'অসম্ভব।' আমি মিশরে থাকার সময় বিস্তর হাবশী দেখেছি। তারা খানদানী নয়—তাদের মুখই আরো কালো করা যায় না, খুদ হাবশীরাজের কথা বাদ দিন।'

মৌলবী সায়েব রাগ করে বললেন, 'ঝকমারি! হাজার দফা ঝকমারি তোমাদের মত বদরসিককে গল্প বলা। পঞ্চম জর্জের রঙ তো ফর্সা তবে কি ভয় পেলে তাঁর রঙ

আরো ফর্সা হয় না?'

আমি 'আলবৎ আলবৎ' বলে মাপ চাইলুম।

মৌলবী সায়েব বললেন, 'শেষটায় হাবশীরাজ মহারাজের সেক্রেটারির সঙ্গে ভাব জমিয়ে বহুৎ সওয়াল-জবাব করলেন আর মনে মনে একটা ভেট ঠিক করে নিলেন।

সে বৎসর গরম পড়েছিল বেহদ্‌। লু চলেছিল জাহান্নমের হাওয়া নিয়ে, আর আকাশ থেকে ঝরেছিল দোজখের আগুন। 'সয়াজী সরোবরের' বেবাক নিলুফরী পানি খুদাতালা বেহেশ্‌ত বাসিন্দাদের জন্য দুনিয়ার মাথট হিসেবে তুলে নিয়েছিলেন, আর বরোদার জৈনরা পাখীদের জন্য গাছে গাছে জল রেখেছিল হাজারো রূপিয়া খর্চা করে। শুকনো গরমের জুলুমে আমার দাড়ি গোঁপ পর্যন্ত যখন পট পট করে ফেটে যাচ্ছিল এমন সময় শহরময় খবর রটলো, হাবশী বাদশাহ্ হাইলে সেলাসিস মহারাজা সয়াজী রাওকে এক জোড়া সিংহ-সিংহী তোফা পাঠিয়েছেন,—তাঁর মুল্লুকের সব চেয়ে বড় জানোয়ার। 'হিজ হাইনেস সয়াজী রাও মহারাজ সেনা-খাস-খেল বাহাদুর, ফরজন্দ-ই-দৌলত-ই-ইনকলিসিয়া, শমশের জঙ্গ বাহাদুরের কদমের ধুলো হবার কিস্মৎ এদের নেই, তবু যদি মহারাজ মেহেরবাণী করে এদের গ্রহণ করেন, তবে হাবশী বাদশাহ্ বহুৎ, বহুৎ খুশ হবেন।'

সেই গরমের মাঝখানে খবরটা রটল আগুনের মত। আর গুজোব রটল ধুঁয়োর মত, তার চেয়েও তাড়াতাড়ি। কেউ বলে, 'ওরকম জোড়াসিংগি লণ্ডন শহরের মত চিড়িয়াখানাতেও নেই', কেউ বলে, 'হাবশী বাদশা খাস ফরমান দিয়ে মানুষের মাংস খাইয়ে খাইয়ে এদের তাগড়া করিয়াছেন', কেউ বলে, 'এদের গর্জনের চোটে জাহাজের তাবৎ লস্কর-সারেঙ বদ্ধ কালা হয়ে গিয়েছে।' আরো কত আজগুবি কথা যে রটল তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

সয়াজী রাও যে খুশ হয়েছিলেন সে সংবাদটাও শহরে রটল। চিড়িয়াখানার ম্যানেজারের উপর হুকুম হল হাবশী সিংগির জন্য খাস হাবেলী তৈরী করবার। কামাররা সব লেগে গেল খাঁচা বানাতে—দিনভর দমাদ্দম লোহা পেটার শব্দ শুনি, আর শহরের ছোঁড়ারা তখন থেকেই খাঁচার চতুর্দিকে ঝামেলা লাগিয়ে মেহমানদের তসবির-সুরৎ নিয়ে খুশ-গল্প জুড়ে দিয়েছে।

ম্যানেজার বোম্বাই গেলেন সিংগিদের আদাব-তসলিমাত করে বরোদা নিয়ে আসার জন্য। সেখান থেকে তারে খবর এল মেহমানরা কোন গাড়িতে বরোদা পৌঁছবেন। সেদিন শহরের ছ' আনা লোক স্টেশনে হাজিরা দিল—হুজুরদের পয়লা নজরে দেখবার জন্য। হাবেলিতে যখন তাদের ঢোকানো হল, তখন শহরের আর বড় কেউ বাদ নেই। সয়াজী মহারাজ শুনলেও গোসা করবেন না বলে বলছি, খুদ তাঁকে দেখবার জন্যও কখনো এরকমধারা ভিড় হয়নি।

আমিও ছিলুম। আর যা দেখলুম তার সামনে দাঁড়াবার মত আর কোনো চীজ আমি কখনো দেখিনি। আমার বিশ্বাস এ-জোড়া সিংগি দেখার পর আর কেউ খুদাতালায় অবিশ্বাস করবে না।তোমরা কি সব বলো না, 'নেচার' 'নেচার'—সব কিছু নেচার বানিয়েছে'—

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'আমি তো কখনো বলিনি।'

মৌলবী সায়েব ট্যারচা হাসি হেসে বল্লেন, 'সিংগি দুটোর সামনে কাউকে আমি বলতেও শুনিনি। তোমাদের ঐ নেচার কোন কোন জিনিস পয়দা করেছেন জানিনে কিন্তু এরকম সিংগি বানানো তাঁর বাপেরও মুরদের বাইরে।

কী চলন, কী বৈঠন, ক্যা পশম, ক্যা গর্দন! পায়ের নখ থেকে দুমের লোম পর্যন্ত সব কুছ গড়া হয়েছে, স্রেফ এক চীজ দিয়ে—তাকৎ! খুদার কেরামতি বুঝবে কে, তাই তাজ্জব মেনে বার বার তাঁকে জিজ্ঞেস করি, 'এ রকম মাতব্বরকে তুমি এ-দুনিয়ার রাজা না করে মানুষের হাতে সব কিছু ছেড়ে দিলে কেন?'

সিংগি জোড়াকে দেখবার জন্য আহমদাবাদ, আনন্দ, ভরোচ, সুরট এমন কি বোম্বাই থেকে লোক আসতে লাগল। ফুল ফুটলে কেউ লক্ষ্য করে, কেউ করে না, চাঁদ উঠলে কেউ খুশী হয়, কেউ তাকায় না, কিন্তু এ-জোড়া সিংগি দেখে মনে মনে এদের পায়ে তসলিম দেয়নি, এ রকম লোক আমি কখনো দেখিনি।

তবে আমি নিজে এদের দেখেছি সব চেয়ে বেশী। কোঁচড় ভরে ছোলাভাজা নিয়ে সামনের গাছতলায় বসে আমি দিনের পর দিন কাটিয়ে দিয়েছি এই রাজা-রাণীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। তাঁদের ভাষা বুঝিনি এ কথা সত্য, কিন্তু একটা হক বাৎ আমি তাঁদের ঘোঁতঘোঁতানি থেকে সাফ সাফ বুঝে নিয়েছিলুম, সেটা হচ্ছে এই—হিন্দুস্থান মুল্‌কটা হুজুরদের বিলকুল পছন্দ হয়নি।

তাই যেদিন ফজরের নামাজ পড়ার পর শুনতে পেলুম সিংগিটা মারা গিয়েছে তখন আশ্চর্য হলুম না বটে কিন্তু পাগলের মত ছুটে গেলুম চিড়িয়াখানায় আর পাঁচজনেরই মত। ভোরের আলো তখনো ভালো করে ফোটেনি, দেখি এর-ই মাঝে জলসা জমে গিয়েছে। সবাই মাটিতে বসে গালে হাত দিয়ে খাঁচাটার দিকে তাকিয়ে আছে, যেন এক হাট লোকের সক্কলেরই বড় ব্যাটা মারা গিয়েছে।

আর সিংহরাজ শুয়ে আছেন পুবদিকে মুখ করে। আহা হা, কী জৌলুষ কী বাহার! দেখে চোখ ফেরাতে পারলুম না। জ্যান্ত অবস্থায় চলাফেরার দরুনই হোক অথবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক তার সম্পূর্ণ শরীরের পরিমাণটা যেন আমার চোখে ঠিক ধরা দেয় নি, আজ স্পষ্ট দেখতে পেলুম কতখানি জায়গা নিয়ে হুজুর শেষ-শয্যা পেতেছেন। মনে মনে বললুম,আলবৎ আলবৎ। এই শেষশয্যা দেখেই কবি ফিরদৌসী তাঁর শাহনামা কাব্যে সোহরাবের মৃত্যুশয্যার বর্ণনা করেছেন।

আর সিংগিনী ! সে বোধ হয় তখনো ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। সিংগির চতুর্দিকে চক্কর লাগাচ্ছে তার গা শুঁকছে আর আমাদের দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন কোনো মহারাণী ব্যাপারটা না বুঝতে পেরে প্রধানমন্ত্রীকে সওয়াল করছেন।

বিহানের পয়লা সোনালি রোদ এসে পড়ল সিংহের কেশরে। শাহান-শাহ্ বাদশার সোনার তাজে যেন খুদাতালা আপন হাতে গলা-সোনা ঢেলে দিলেন। সে তসবিরে চোখ ভরে নিয়ে আমি বাড়ি ফিরলুম।

বরোদা শহর শোকে যেন নুয়ে পড়ল। যেখানে যাও, ঐ এক কথা, আমাদের সিংহ গত হয়েছেন।

সেদিন স্কুল-কলেজ বসলো না, ছেলে-ছোকরারা খাঁচার সামনে বসে আছে,—চুপ করে। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যাচ্ছে কারো মুখে কথাটি নেই। আপিস-আদালত পর্যন্ত সেদিন নিমকাম করলো।

সিংগির লাশ বের করতে গিয়ে ম্যানেজারের জিভ বেরিয়ে গেল। সিংগিনী খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে; খাবার লোভ দিয়ে যে তাকে পাশের খাঁচায় নিয়ে এ-খাঁচা থেকে লাশ বের করা হবে তারো উপায় নেই। শেষ পর্যন্ত কি কৌশলে মুশকিল ফৈসালা হল জানিনে, আমি দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে পড়েছিলুম।

তারপর আরম্ভ হল সিংগিনীর গর্জন আর দাবড়ানো। সমস্ত দিন খাঁচার ভিতর মতিচ্ছন্নের মত চক্কর খায় আর মাঝে মাঝে লাফ দিয়ে খাঁচার দেয়ালে দেয় ধাক্কা। এরকম খাঁচা ভাঙবার মতলব আগে কখনো সিংহ সিংহী কারো ভিতরেই দেখা যায় নি। এখন সিংগিনী খাওয়া কমিয়ে দিয়েছে কিন্তু বেড়ে গেছে খাঁচাটাকে ভাঙবার চেষ্টা। সেই দুর্বল শরীর নিয়ে কখনো সমস্ত তাগদ দিয়ে খাঁচায় দেয় ধাক্কা, কখনো শিকগুলোকে খামচায়, আর কখনো লাফ দিয়ে তেড়ে এসে মারে জোর গোত্তা। সে কি নিদারুণ দৃশ্য !

সয়াজী রাও খবর পেয়ে হুকুম দিলেন, 'বাড়িয়া, উম্‌দা হাবশী সিংহ্ যোগাড় করার জন্য আদিস আব্বাবার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করো, কিন্তু সাবধান হাবশীরাজ যেন খবর না পান তাঁর দেওয়া সিংহ্ মারা গিয়েছে। আর ততদিনের জন্য কাঠিয়াওয়াড় থেকে একটা দিশী সিংহ্ আনবার ব্যবস্থা করো। সেও যেন উম্‌দাসে উম্‌দা হয়, রুপেয়া কা কুছ্ পরোয়া নাহী।'

সয়াজী রাও বাদশার দয়ার শরীর, তাঁর লোমে লোমে মেহেরবাণী। খুদাতালা তাঁর জিন্দেগী দরাজ করুন, হরেক মুশকিল আসান করুন—বরোদার সিংহই বুঝতে পারে হাবশী সিংগিনীর দর্দ।

এক মাস বাদে বর এলেন কাঠিয়াওয়াড় থেকে। এ-এক মাস আমি চিড়িয়াখানায় যাইনি। পাঁচজনের মুখে শুনলুম, সিংগিনীর দিকে তাকানো যায় না—তার চোখমুখ দিয়ে আগুনের হল্কা বেরচ্ছে।'

মৌলবী সায়েব গল্প বন্ধ করে জানালার দিকে কান পেতে বললেন, 'আজান পড়লো। তাড়াতাড়ি শেষ করি।

দুলহাকে যখন খাঁচায় পোরা হবে তখন 'চার আঁখে' মিলবার তসবির দেখার জন্য আমি আগেভাগেই খাঁচার সামনে গিয়ে হাজির হলুম। সিংগিনীর চেহারা দেখে আমার চোখে জল এল অসম্ভব রোগা দুবলা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তেজ কমেনি এক রত্তিও।

কাঠিয়াওয়াড়ের দামাদ এলেন হাতী-টানা গাড়িতে করে। তিনিও কিছু কম না। কিন্তু হাবশী সিংগীর যে তসবির আমার মনের ভিতর আঁকা ছিল তাঁর তুলনায় বে-তাগদ, বে-জৌলুস,বে-রৌশন। সিংহ হিসেবে খাবসুরৎ, কিন্তু দুলহা হিসাবে না-পাস। খাঁচার দরজা দিয়ে দামাদ ঢুকলেন আস্তে আস্তে। সিংগিনী এক কোণে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে এমন এক অদ্ভুত চেহারা নিয়ে যে আমি তার কোনো মানেই করতে পারলুম না। তারপর যা ঘটলো তার জন্যে আমরা কেউ তৈরী ছিলুম না। হঠাৎ সিংগিনী এক হনুমানী লম্ফ দিয়ে, খাঁচা ইস-পার উস-পার হয়ে পড়লো এসে সিংগির ঘাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তিন কিম্বা চার-খানা বিরাশি শিক্কার থাবড়া ! কাঠিয়াওয়াড়ি দামাদ ফৌত ! বিলকুল ঠাণ্ডা !'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'সে কি কথা?'

মৌলবী সায়েব বল্‌লেন, 'এক লহমায় কাণ্ডটা ঘটলো ; কেউ দেখলো, কেউ না।'

আমি বললুম, 'একটা লড়াই পর্যন্ত দিলে না?'

মৌলবী সায়েব বললেন 'না।'

আমি বল্‌লুম, 'তারপর?'

মৌলবী সায়েব বললেন, 'তারপর আর কিছু না। আমি এখন চললুম, গল্পে মেতে গেলে আমার আর কোনো হুঁশ থাকে না।'

দরজার কাছে গিয়ে মৌলবী সায়েব থামলেন। বল্‌লেন, 'হুঁ' একটা কথা বল্‌তে ভুলে গিয়েছি।

খবরটা সয়াজী রাও-এর কাছে পৌছে দিতে কেউই সাহস পান না। শেষটায় তাঁর খাস পেয়ারা শহর-কাজী আর ধর্মাধিকারী নাড়কর্ণিকে ধরা হল। তাঁরা যখন খবরটা দিলেন তখন মহারাজ নাকি একদম কোনো রকমেরই চোটপাট করলেন না। উল্টে নাকি মুচকি হাসি হেসে বল্‌লেন,

'আমি যখন বিধবা-বিবাহের জন্য একটা নয়া আন্দোলন আরম্ভ করতে চেয়েছিলুম তখণ তোমরাই না গর্ব করে বলেছিলে, এদেশের খানদানী বিধবা—তা সে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক—নূতন বিয়ে করতে চায় না? হাবশী সিংগিনী এদেরও হার মানালে যে।'